যুগান্তর

২৬/৭/২০০৭

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১০ ... কলাম ...

রোকেয়া দেলোয়ার

দেওবন্দ মাদ্রাসা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাই এর শিক্ষা ব্যবস্থাও সর্বশ্রেষ্ঠ, সার্বজনীন এবং পরিপূর্ণ। এর ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহ যার উৎস হল ওহি. শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর হেরা গুহায় প্রথম যে ওহি অবতীর্ণ হয় তাহল 'ইক্বরা বিসমি রাব্বি...' এ থেকেই শুরু হয় সলামী শিক্ষার অবিচ্ছিন্ন পথচলা।

মহানবী মক্কার দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশে আরকাম ইবনে আবিল হকামের গৃহে দীনের শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তাছাড়া ওয়াক্কাস নামক সাহাবীর ঘরেও দীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী রাসূল (সাঃ) নিজেই শিক্ষা দিতেন। এগুলোই ছিল মক্কার সর্বপ্রথম মাদ্রাসা। এভাবেই শুরু হয়েছিল কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার ধারা। হিযরতের পূর্বে মদীনার নওমুসলিমদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য মহানবী মুসআব ইবনে উমাইর (রা.), আসআদ বিন যুয়ারা (রাঃ), সা'আদ ও উসাইদ (রা.)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় মদীনায় ফিজার গোত্রে একটি প্রশস্ত ঘরে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছিলেন।

প্রত্যেক মুসলমানের অজ্ঞতা-মূর্খতা দূর করে একটি উন্নত, সুসভ্য, শক্তিশালী জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে মসজিদে নববী সংলগ্ন চত্বরে মহানবী নিজেই সাহাবীদের শিক্ষা দিতেন এবং এর প্রশিক্ষক ও ব্যবস্থাপকও ছিলেন তিনি নিজেই। এছাড়াও নবী করিম (সা.) মদীনা গমনের কিছুদিনের মধ্যে মদীনার বিভিন্ন পল্লীতে আরও ৯টি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং কুবা মসজিদে প্রায়ই রাসূল (সা.) শিক্ষার কার্যক্রম তদারকি করতেন এবং মহিলাদের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে সপ্তাহে একদিন সমবেত মহিলাদের আবশ্যকীয় বিষয়াবলী শিক্ষা দিতেন। এভাবেই বিস্তৃত আকারে মাদ্রাসা শিক্ষার ধারা চলতে থাকে মহানবীর জীবদ্দশায়।

পরবর্তী সময়ে খেলাফায়ে রাশেদীন (রা.) ব্যাপকভাবে এ শিক্ষার আলোকবর্তিকা প্রচার করেন এবং তাদেরই উৎসাহ-অনুপ্রেরণায় হযরত বনে মাসউদ (রা.) কুফায়, হযরত ইবনে ওমর (রা.) ও আবু হুরায়রা (রা.) মদীনায় এবং অন্য সাহাবারা ইসলামী খেলাফতের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা দান করে যান। পরবর্তী যুগে মদীনা, কুফা, বসরা, মিসর, বাগদাদ, দামেস্ক, স্পেন, মা ওরাউন্নাহারের এলাকা দীনি মাদ্রাসার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত হয়। হিজরীয় প্রথম শতকের শেষ ভাগে এ শিক্ষাধারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং হিজরির সপ্তম শতকের শেষভাগে বাংলার তৎকালীন রাজধানী সোনারগাঁও ও শায়ক শরফুদ্দীন আবু তা ওয়ামার নেতৃত্বে একটি বিরাট শিক্ষাগার গড়ে ওঠে যা কিনা সর্বপ্রথম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে উপমহাদেশেই স্বীকৃত। হিজরীর অষ্টম শতকে ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে শিক্ষকদের জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে ভাতা দেয়া হতো।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইংরেজ জাতি উপমহাদেশে বাণিজ্যে লিপ্ত থাকলেও মুসলিম শাসকগণের উদাসীনতা, অপরিণামদর্শিতা ও দুর্বলতার সুযোগে রাজনীতিতে প্রবেশ করে এবং সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র ও কূটনীতির মাধ্যমে ১৭৫৭ সালে বাংলার স্বাধীনতা এবং ১৮০৩ সালের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ করায়ত্ত করে নেয়। তারা মুসলমানদের তাদের গোলাম করার অপচেষ্টা করে যা ভারতের দূরদর্শী আলেম সমাজ ও সচেতন মুসলিমরা কোন মতেই মেনে নিতে পারে না। তাই আরম্ভ হয় ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন। 'কেন মুসলিমগণ তাদের শাসন মেনে নেয় না। কেন বারবার তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, কেন তাদের সেবাদাসে পরিণত করা যায় না' তা পর্যালোচনা করে ইংরেজরা এ সত্য উদঘাটন করে যে ভারতের মুসলিমদের রয়েছে প্রবল ধর্মীয় চেতনা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, ঈমানি শক্তি ও জেহাদি প্রেরণা যা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার ফল। আর এর প্রচার ঘটেছে ভারতের হাজার হাজার মক্তব, মাদ্রাসা ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে লর্ড ম্যাকেলে বলেন- 'মুসলমানদের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেয়ায় ভারতীয় মুসলিমরা আমাদের ঘৃণার চোখে দেখে। তার প্রতিকারের জন্য ভারতে ইসলামী শিক্ষা সভ্যতা চালু করতে হবে যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে তাদের চামড়ার রং থাকবে শুধু ভারতীয় বাকি সবকিছু বিশেষ করে মন ও চিন্তাধারা বিলেতি হবে, নিজেদের সকীয়তা বর্জন করে এরাই অন্যদের ও আমাদের রঙে রঞ্জিত করার চেষ্টা করবে, আমাদের দুঃশাসক ভাববে না, বন্ধু ও মুরব্বি মনে করবে। তাছাড়া এ শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু লোককে কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ দিলে তারা গর্ববোধ করবে এবং নিজেদের যোগ্য ও আস্থাভাজন কর্মচারী মনে করে কাজ করবে। ফলে শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্মচারীর অভাবও আমাদের দূর হবে।"

এ ধারণা থেকেই তারা মুসলিমদের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের চেষ্টা হিসাবে উপমহাদেশের হাজার হাজার ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যার ব্যয়ভার রাজকোষ বহন করত তা বন্ধ করে দেয় এবং আমীর-উমরাদের ওয়াকফকৃত সম্পত্তি যার সাহায্যে ওই প্রতিষ্ঠানগুলো চালিত হতো ইংরেজ সরকারের এই ঘৃণ্য পদক্ষেপ উপমহাদেশের মুসলিম জাতিকে অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার চরমে পৌঁছে দেয়। পরবর্তী প্রায় এক শতাব্দীকাল মুসলিম সম্প্রদায় অশিক্ষার এই অজ্ঞতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। ফলে এদেশের মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় সব কার্যক্রম ও অর্থনৈতিক সাফল্য থেকে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে থাকে এবং হিন্দুদের তুলনায় অদ্যাবধি শিক্ষা দীক্ষা ও জ্ঞান গরিমায় পিছিয়ে রয়েছে। তাই ১৮৫৫ সালে লর্ড ডালহৌসি আট লাখ পাউন্ডের বিনিময়ে মাদ্রাসাগুলোর ওপর করের বোঝা চাপিয়ে দেয়। ফলে ক্রমান্বয়ে বাংলা, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের ৮০ হাজার মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যায়। ইংরেজ সরকার মাদ্রাসাগুলোর পাঠ্য তালিকা পরিবর্তন করে নতুন ধরনের শিক্ষাগ্রহণে জনগণকে বাধ্য করে। প্রথমদিকে মুসলমানরা এ থেকে দূরে থাকালেও ব্রিটিশ সরকারের দেয়া চাকরি ছাড়াও নানা সুবিধা প্রদান এবং নিজেদের অর্থনৈতিক অসাড়ত্বে তারা অনন্যোপায় হয়ে এ শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য হয়।

'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড এবং মেরুদণ্ড রক্ষা পেলে জাতি রক্ষা পাবে'– এ লক্ষ্যে শামেলি ময়দানের সিপাহশালার হযরত কাসেম নানুতবী (র.) যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এসে জাতির এ দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে মুসলিমদের সব দিক রক্ষা করতে তৎকালীন ভারতবর্ষের ওলামায়েকিরামদের সঙ্গে নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ ছেড়ে ১৮৬৭ সালে এক ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন, ইতিহাসে যা দারুল উলুম দেওবন্দ নামে প্রসিদ্ধ। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি নির্ভর করে পাঠ্যসূচির সামগ্রিকতা, সার্বজনীনতা ও ভারসাম্যের ওপর। দারুল উলুম দেওবন্দ সামগ্রিকতা ও সার্বজনীনতার আলোকে শিক্ষাসূচিতে প্রচলিত সব বিষয় ও শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্তিসহ এর যথার্থ মূল্যায়ন করে এমন একটি শিক্ষাধারা প্রবর্তন করে যা এর আগে ভারতবর্ষে ছিল না। ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিস্ময়কর বিপ্লব সাধিত হয় এবং এর যে বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে ওঠে তাহল মাযহাবগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনে উদার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পর্যালোচনা ও হকপন্থী মাযহাবকে স্বীকৃতি দেয়, হকপন্থী। ফেরকাগুলোর আকিদাগুলোকে সমন্বিত করে একটি সর্বজনগ্রাহ্য বিশুদ্ধ ধারার প্রবর্তন করে, মাযবাহী সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ওঠে হাদীসের সরল ব্যাখ্যা প্রদান করে, তাফসির ও হাদীস শাস্ত্রকে যথাথ মর্যাদা দান করে, ইসলামবিদ্বেষীদের মতাদর্শ অনুযায়ী রচিত ইসলামী ইতিহাসের বিভ্রান্তিকর তথ্যগুলো গবেষণালব্ধ ঐতিহাসিক তথ্যের মাধ্যমে খণ্ডন করে সঠিক ও তথ্যনির্ভর ইসলামী ইতিহাস রচনা করে, নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধনে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে, শিক্ষার সঙ্গে আধ্যাত্মিক, শরিয়ত ও তরিকতের সমন্বয় সাধন করে, বিভক্ত নানা ধারাগুলোকে সমন্বিত করে বিশুদ্ধ ও সহজসাধ্য ধারা পেশ করে, ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অন্যান্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করে, কুরআন ও সুন্নাহর বলিষ্ঠ শিক্ষার আলোকে ইসলাম থেকে শিরক, বিদআত ও কুসংস্কার উচ্ছেদ করে মুসলমানদের রাজনৈতিক উত্তরণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভের চেতনা জোগায়।

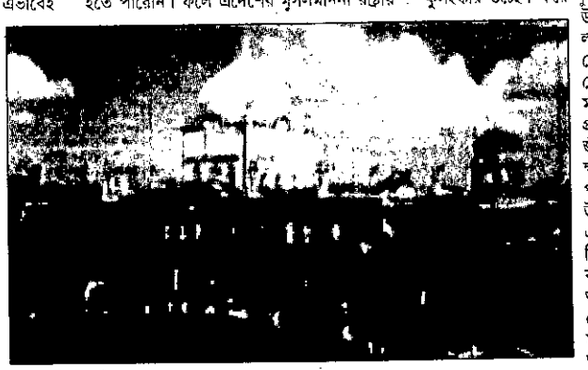

মোদ্দাকথা, দারুল উলুম দেওবন্দ সাধারণ কোন মাদ্রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয় বরং 'আমি জীবিত থাকব আর দীন ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা হতে পারে না'– এই চেতনায় উজ্জীবিত মহামুক্তির এবং দীনের জন্য নিবেদিত মানব কল্যাণকামিতা বোধে অনুপ্রাণিত এক বৈপ্লবিক চেতনা। দেওবন্দ মাদ্রাসা বিশ্ববিখ্যাত আলেম-উলামার সেবা পেয়েছিল। এর মধ্যে হাকিমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী যানবী (র.) মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুলী (র.) মাওলানা মাহবুব হাসান (র.) অন্যতম। এসব সর্বজনশ্রদ্ধেয় মোহাদ্দেসের তত্ত্বাবধানে এ মাদ্রাসার সুনাম শতবর্ষ আগেই বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশ্বের সব মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ থেকেই বিদ্যাকামী ছাত্ররা দেওবন্দ মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণের জন্য আগমন করত। এ ধারা অদ্যাবধি অব্যাহত আছে। এখনও বিশ্বের যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের মাদ্রাসা ছাত্রদের কাম্য থাকে উচ্চ শিক্ষার্থে দেওবন্দে গমন করা। বাংলাদেশের শীর্ষ পর্যায়ের ওলামাগণের অধিকাংশই দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্র। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটের আলোকে আমরা বলতে পারি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তথা সব ক্ষেত্রেই ইসলাম এবং মুসলিমদের হেফাজত, আগ্রাসন ও পরাধীনতা থেকে মুক্তি এবং সর্বোপরি সমাজ সংস্কারের মহান চেতনাই দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার মূল কথা।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, দেওবন্দ

তথ্য সহায়ক : দারুল উলুম দেওবন্দ : ঐতিহ্য